তাওহীদ আল ইবাদাহ

যে কারণে জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হবে

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

تَوْحِيْدُ الْعِبَادَةِ

তাওহীদ আল ইবাদাহ

“যে কারণে জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হবে”

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

তাওহীদ আল ইবাদাহ

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদকঃ জিহাদুল ইসলাম
সহ-সম্পাদকঃ রাফিউল ইসলাম

প্রথম প্রকাশঃ ১৬ই সাবান, ১৪৪৫ হিজরী
২৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ঈসায়ী

প্রকাশনায়ঃ অন্তিম প্রকাশনী

হাদিয়াঃ ১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

অন্যান্য বইগুলোঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks
যোগাযোগঃ backup.2024@hotmail.com
বই কিনুনঃ http://cutt.ly/ontim_prokashoni

TAWHEED AL ‘IBADAH BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED ON: 27th FEBRUARY 2024 ISAYI, 16th SABAN 1445 AH HIJRI.

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, পৃষ্ঠা ৩০৬।

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন, ওয়াল আ-ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন, ওয়াছ ছলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিহী, ওয়া 'আলা আলীহি ওয়া আছহা-বিহী আজমাঈন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম, বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম।

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রতি। অতঃপর তা'লীমুত তাওহীদ নামক কিতাবটি লেখা শেষ করেই আজকে আবার লেখা শুরু করলাম আরেকটি কিতাব। আমি যার নামকরণ করেছি- তাওহীদ আল ইবাদাহ।

মূলত অত্র কিতাবটি তাওহীদ আল ইবাদাহ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র কিতাব। আমি আশা রাখি, অত্র কিতাবটি পাঠের মাধ্যমে মানুষ তাওহীদ আল ইবাদাহ তথা ইবাদাত বা উপাসনায় একত্ব অর্থাৎ বান্দার ইবাদাত গ্রহণের জন্য যে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালাই একক হকদার; তা এই কিতাবটি পাঠের মাধ্যমে পাঠকগণ খুবই সুন্দর ও সহজভাবে বুঝতে পারবেন ইংশাআল্লাহ; কাজেই অত্র কিতাবটি প্রতিটি পাঠকেরই বারং বার মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি। অত্র কিতাবটি পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই যেন আল্লাহ তায়ালার হক বুঝে তাঁর ইবাদাত করার তৌফিক দান করেন। (আমিন)

অতঃপর, কিতাবটি লিখতে বানান বা শব্দগত কোন ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদি কোন ভুল পাঠকের নজরে আসে তবে আমি আশা রাখবো তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

নিবেদক

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

২৩/১২/২০২৩ ইং

আল্লাহর ডাক ও আদেশ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীম এর সূরাহ্ বাকারহ এর ২১ নং আয়াতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ডাক দেন ও আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ

হে মানুষ! হে মানুষ সকল বা হে লোকেরা!

এখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোন বিশেষ শ্রেণীকে ডাক দেন নাই। যেমন-
হে মুমিনগণ! হে চাদর পরিহিত ব্যক্তি! হে কম্বল পরিহিত ব্যক্তি! হে মুনাফিকগণ! হে কাফেরগণ ইত্যাদি। এখানে ডাক দেওয়া হয়েছে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী ইত্যাদি সকল প্রকার মানুষকে। এখানে সাদা-কালো, খাটো-লম্বা, নিম্ন শ্রেণীর ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের, সকল রঙ এর, সকল প্রকার মানুষকেই আল্লাহ তা'য়ালা ডাক দিয়েছেন। অতঃপর সকলকে ডাক দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন-

اعْبُدُوا رَبَّكُمْ

তোমরা ইবাদাত কর তোমাদের প্রতিপালকের।

অতএব, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ডাক দিয়ে তাঁর গোলামী বা দাসত্ব করার আদেশ করেছেন যে- তোমরা তোমাদের রব্ব বা প্রতিপালকের ইবাদাত বা দাসত্ব করো।

এখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জাত নাম الله ব্যবহার না করে বরং তাঁর গুণবাচক নাম ব্যবহার করেছেন। আর সেই নামটি হলো- **"রব্ব"**

এখানে রব্ব শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো- রব্ব এমন একটি গুণবাচক নাম, যা একের ভিতর সব। যেমন আমি তা'লীমুল তাওহিদ নামক কিতাবে তাওহীদ আর রুবূবিয়াহ এর আলোচনায় উল্লেখ করেছি-

'রব্ব'- প্রভূ বা সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী প্রতিপালক বা পালনকর্তা। এক কথায় রব্ব বলতে এমন কাউকে বুঝায়, যিনি তার বান্দাকে সৃষ্টি থেকে শুরু করে তার

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান দান করেন এবং একই সাথে বান্দার অন্তরের খবরও জানেন ও বান্দার অন্তরেরও পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি বান্দাকে যেমন জীবন দান করতে পারেন, তেমনি মৃত্যুও ঘটাতে পারেন এবং বান্দাকে পুনরায় জীবন দান করে নিখুঁত তথ্য উপস্থাপন করে, পরিপূর্ণভাবে সঠিক বিচার করে, অপরাধী হলে শাস্তি হিসেবে জাহান্নাম ও পূণ্যবান হলে পুরষ্কার হিসেবে জান্নাত দান করতে পারেন। অর্থাৎ সৃষ্টি করা থেকে সকল কিছু দিয়ে প্রতিপালন করা ও কর্ম অনুযায়ী নিখুঁত ফায়সালা করার কর্তৃত্ব যার আছে তিনি প্রকৃত রব্ব।

আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই গুণবাচক নাম রব্ব-ই ব্যবহার করেছেন এখানে। যেন এক কথায় বোঝা যায়, তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর তিনিই পালনকর্তা। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিচ্ছেন তোমরা ইবাদাত কর, তোমাদের পালনকর্তার। আর ইবাদাত হলো- আদেশ-নিষেধ পালন করা, সর্বোচ্চ ভয় করা ও সর্বোচ্চ ভালোবাসা, কর্মনীতি মানা, স্বরণ করা, বিধি-বিধান মানা ইত্যাদি। এক কথায় দাসত্ব বা গোলামী করতে হবে মহান রব্ব এর। এখন প্রশ্ন হলো অত্র আয়াতে কি শুধু মানুষকেই তাঁর মহান রব্বের ইবাদাত করতে বলা হয়েছে নাকি প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে ইবাদাতের আদেশ প্রদান করলেও পরোক্ষভাবে আরো কোন জাতি যুক্ত রয়েছে?

উত্তর- হ্যাঁ অবশ্যই অন্য একটি জাতিও যুক্ত রয়েছে। এখানে, 'হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত করো' - আদেশে হে মানুষ সকলের মধ্যে পরোক্ষভাবে জীনদেরকেও যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই'। (সূরাহ বনি ইসরাইল, আঃ ২৭)

এখানে প্রত্যক্ষভাবে অপচয়কারীকে ভাই বলা হয়েছে; তাহলে কি অপচয়কারী নারীগণ এই গোনাহের অন্তর্ভুক্ত থাকবেনা? তারা কি ইচ্ছে মত অর্থ-সম্পদ অপব্যয় করতে পারবে? না; বরং অপব্যয়কারী নারীগণও ঐ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অত্র আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে অপব্যয়কারী পুরুষদের শয়তানের ভাই হিসেবে উল্লেখ করলেও পরোক্ষভাবে অপব্যয়কারী নারীগণও ঐ শয়তানের বোন হিসেবে যুক্ত হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেখানে সমস্ত মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য আদেশ দিয়েছেন, সেখানে পরোক্ষভাবে তাতে জীনরাও যুক্ত রয়েছে। কেননা, মহান

আল্লাহ তা'য়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন- ''আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে''। (সূরাহ্ যারিয়াত, আঃ ৫৬)

অর্থাৎ, অত্র আয়াতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য জীন ও মানুষ উভয়কেই আদেশ প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু, বিশেষ করে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকেই এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''স্বরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি''। (সূরাহ বাকারহ, আঃ ৩০) সেহেতু অত্র আয়াতে (২:২১) বিশেষ করে মানুষকেই সম্বোধন করে আল্লাহর ইবাদাত করতে আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালা

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

''যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও (সৃষ্টি করেছেন)''।

অত্র আয়াতের (২:২১) প্রথমাংশে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এর সমস্ত মানুষকে ডাক দিয়েছেন এবং তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন- ''তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত কর''। অর্থাৎ মানুষকে ডাক দিয়ে বিশাল এক মহাসমাবেশে তাদেরকে একত্রিত করে মানুষদের রব্ব বা প্রভূ হওয়া যায় না বা মানুষকে তার দাসত্বের জন্য আহব্বান বা আদেশ করলেই মানুষদের দাসত্ব বা ইবাদাত গ্রহণের হকদার হওয়া যায় না। যেমন, ত্বগুতী শাসক ফিরআউন মিশরের জনগণকে ডাক দিয়ে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে সেই মহাসমাবেশে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছিল- ''আমিই তোমাদের রব্ব''। (সূরাহ্ নাজিয়াত, আঃ ২৩-২৪)

সেই বিষয়টিই আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতের পরের অংশে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষদের রব্ব মানুষদের প্রতি প্রভূত্ব দেখাতে হলে বা মানুষদের প্রতি কোন জীবন-ব্যবস্থা প্রদান করতে হলে সর্বপ্রথম মানুষদের স্রষ্টা হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যে মানুষকে ডাক দিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন, তার প্রথম কারণ- মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালা। আর সে জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- "যিনি অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও (সৃষ্টি করেছেন)"।

এখানে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন বলতে- যাদের কাছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রিসালাতের কথা ও কুরআন মাজীদ এর কথা পৌঁছেছে বা পৌঁছাবে তাদেরকে বুঝিয়েছেন। আর তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও সৃষ্টি করেছেন বলতে- যাদের কাছে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রিসালাতের কথা ও কুরআন মাজীদ এর কথা পৌঁছেছে বা পৌঁছাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর নবুওয়াতের পূর্বের মানুষদের এবং তার নবুওয়াতের পর থেকে কিয়ামাত অব্দি আগমনকারী মানুষদের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। মহান আল্লাহ্ তায়ালাই যে প্রকৃত স্রষ্টা সেই বর্ণনা বা প্রমানাদিও মহান আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পানির দ্বারাই সকল কিছুর সৃষ্টির সূচনা করেন

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা কুফুরি করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোত ভাবে তথা একত্রিত ছিলো। অতঃপর, আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না"। (সূরাহ্ আম্বিয়া, আঃ ৩০)

অর্থাৎ, সৃষ্টির সূচনা টা শুরু হয় পানি দিয়েই। আর আসমান ও জমিন তখন একত্রিতভাবে একটি আকৃতি নিয়ে ছিলো। আর সেই সময় মহান আল্লাহ তায়ালার

মহা আরশ ছিলো পানির উপর। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ''আর তিনিই আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর আরশ ছিলো পানির উপর''। (সূরাহ্ হুদ, আঃ ০৭)

অতএব, বুঝা যায় পানি আল্লাহ্ তায়ালার প্রথম সৃষ্টিগুলোর অন্যতম একটি। আর প্রথম সৃষ্টি কুরসী তৎপর আরশ তৎপর কলম তৎপর খাতা তৎপর পানি। (আল্লাহই অধিক জানেন) অর্থাৎ এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন চতুর্দিকে শুধু পানিই ছিল। আর সেই পানির উপরে ভাসমান ছিল মহান আল্লাহ্ তায়ালার আরশ। অতঃপর, মহান আল্লাহর আদেশে পানির ফেনা তৈরি হয়। যা পরিমাণে পানি হতে অনেক কম। আর সেই ফেনা হতেই মহান আল্লাহ তায়ালা মাটি সৃষ্টি করেন। অতঃপর, মহান আল্লাহ্ তায়ালা একত্রিত থাকা আসমান ও জমিনকে আদেশ প্রদান করেন পৃথক হওয়ার। ফলে আসমান ও জমিন পৃথক হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ''অতঃপর তিনি তথা আল্লাহ তাকে তথা আসমান ও জমিনকে বললেন, তোমরা উভয়েই আল্লাহর আদেশ পালন করো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা আনুগত্যের সাথে আদেশ পালন করলাম''। (সূরাহ হা-মীম আস-সাজদাহ্, আঃ ১১)

অতঃপর, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের প্রয়োজনার্থে আসমান-জমিনকে সুসজ্জিত ভাবে সাজিয়ে বসবাসের পরিবেশ তৈরি করে দিলেন। আর মাত্র ছয় দিনে এই বিশাল আসমান তৈরির বর্ণনা মহান আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''বলো, তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তার সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক''। (সূরাহ্ হা-মীম আস-সাজদাহ্, আঃ ০৯)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা মাত্র দুই দিনে এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''তিনি স্থাপন করেছেন অটল পাহাড়সমূহ পৃথিবীতে এবং

তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সম্ভার, প্রার্থনাকারীদের জন্য’’। (সূরাহ হা-মীম আস-সাজদাহ্, আঃ ১০)

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের জন্য পৃথিবীতে যেই পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন তাতেও রয়েছে নানাবিধ কল্যাণ। যেমন আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি- এক সময় শুধু পানি আর পানিই বিদ্যমান ছিল। আর আসমান ও জমিন একত্রে মিশে ছিলো। সেই পানির উপর ভাসন্ত ছিল শুধু মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার আরশ্। অতএব, যেহেতু পানিরই জগৎ ছিলো তখন, আর সেই পানিরই ফেনা থেকে তৈরি মাটি। আর এটাও স্পষ্ট যে, ফেনা পানির উপর ভাসন্তই থাকে। সুতরাং ফেনার নিচেও পানি। আর সেই ফেনা থেকে তৈরি মাটি, কাজেই মাটির নিচেও পানি। অতএব, পানির উপর তার ফেনা যেমন ভাসমান থাকে, তেমন মাটিও ভাসমান থাকবে। যেহেতু, সেই মাটির উপরেই সাজানো হয়েছে পৃথিবী। অতএব, নদীর ঢেউয়ে যেমন নৌকা আন্দোলিত হয়, তেমন পানির উপর থাকা পৃথিবীও আন্দোলিত হবে এটাই স্বাভাবিক; ফলে আন্দোলিত পৃথিবী ক্ষনিকের কর্ম বা সফরের জন্য উপযোগী হলেও স্থায়ী বসবাসের জন্য উপযোগী হবে না এটাও স্বাভাবিক। আর সেজন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী আমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়’’। (সূরাহ্ নাহল, আঃ ১৫)

অতএব, মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা এই পৃথিবী ও তাতে পাহাড়সমূহ এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন মাত্র চার দিনের মধ্যে। অতঃপর, দুই দিনে মহান আল্লাহ তা’য়ালা বিশাল আকাশমন্ডলী কে সপ্তাকাশে পরিণত করেন। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘‘অতঃপর তিনি আকাশ মন্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন’’। (সূরাহ হামীম আস-সাজদাহ, আঃ ১২)

আর এই দুই দিনেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইচ্ছেমত আকাশকে সুসজ্জিত করেন। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধান চালু করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপ মালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ব্যবস্থাপনা"। (সূরাহ হামীম আস-সাজদাহ, আঃ ১২)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপ মালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি"। (সূরাহ মূলক, আঃ ০৫)

অতএব, পৃথিবী ও তাতে পাহাড়সমূহ এবং খাদ্য দ্রব্য ব্যবস্থাকরণ করেছেন চারদিনের মধ্যে আর দুই দিনে আসমানকে সপ্তাস্তরে পরিণত করে তা সুসজ্জিত করে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং তার মধ্যে পাহাড়-নদী, বৃক্ষ-রাজি, খাদ্য-দ্রব্য ব্যবস্থাকরণে মাত্র ছয় দিন সময় ব্যয় করেছেন। (আল্লাহু আকবার)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে; আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ" (সূরাহ আ'রফ, আঃ ৫৪)। আর এই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপনা করেছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার বান্দাদের জন্য। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তিনি পৃথিবীর সমস্ত কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন" (সূরাহ বাকারাহ, আঃ ২৯)। আর মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য আদেশ করে বলেন, "তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক"

(সূরাহ্ আনআম, আঃ ১০২)। আর সেই মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ‘‘আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিবো এবং তা হতে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করবো’’ (সূরাহ ত্বহা, আঃ ৫৫)। অর্থাৎ, সেই আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের কোন সংঘাত নেই যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘‘এবং তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে’’ (সূরাহ ফুরকান, আঃ ৫৪)। কেননা আল্লাহ তায়ালা পানি হতে সৃষ্টি করেছেন মাটি, আর মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। এটা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা এবং একটি নিদর্শন। (আল্লাহু আকবার)

মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ও পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে প্রথম মানুষ বা মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আর সেই কথাই মহান আল্লাহ তা’য়ালা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি’। তারা বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা করি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জানো না’’। (সূরাহ বাকারহ, আঃ ৩০)

এখানে একটি বিষয় হলো- আল্লাহ তায়ালা যখন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি সৃষ্টির কথা ফিরিশতাদের জানালেন তখন ফিরিশতারা বললো, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে?

ফিরিশতাদের এই উক্তি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যাদেরকে আল্লাহ তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার দ্বায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর পরেও তারা আল্লাহর প্রদত্ত পরীক্ষায় ফেল করে, আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে অশান্তি ঘটিয়েছে ও রক্তপাত করেছে। আর সে জন্যই ফিরিশতাগণ অত্র উক্তি করেছেন যে, তারা অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে,

আমরাই আপনার প্রশংসা ঘোষণাকারী ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। এটা ফিরিশতাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে ফিরিশতাগণ নিজ জ্ঞানে ঐ উক্তিটি করতে পারতো না। আর এই বিষয়ে ফিরিশতাগণই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তারা বললো, আপনি মহান, পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। মূলত আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।” (সূরাহ বাকারাহ, আঃ ৩২)

আর আল্লাহ তা’য়ালা ফিরিশতাদের সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই; যা কুরআন মাজীদ থেকেই স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, “নিশ্চয়ই আমি (সেই জাতি সম্পর্কে) যা জানি তা তোমরা জানো না”। (সূরাহ বাকারহ, আঃ ৩০)

আর মানব জাতির পূর্বে যে জাতির পৃথিবীতে বসবাস ছিলো তা হলো- জ্বীন জাতি। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন- “এবং এটার তথা মানুষের পূর্বে সৃষ্টি করেছি জ্বীন, অত্যুষ্ণ অগ্নি হতে”। (সূরাহ হিজর, আঃ ২৭)

অতঃপর, হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির করার জন্য মহান আল্লাহ্ তা’য়ালা একটি কাঁদা মাটির বল তৈরি করলেন। মাটির সেই বলটিতে পৃথিবীর সকল স্থানেরই কিছু করে অংশ ছিলো। আর সেই মাটিগুলো ছিলো শ্বেত সাদা, দুধ সাদা, লালিমা সাদা, হালকা কালো, কালো, শক্ত-নরম, ভালো-মন্দ ইত্যাদি। আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা’য়ালা আদমকে (আঃ) এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জমিন হতে মাটি গ্রহণ করেছিলেন। এ হিসেবেই আদমের (আঃ) সন্তানদের রূপ ও রং বিভিন্ন রকম হয়েছে। তাদের মধ্যে কেহ হয়েছে লাল, কেহ সাদা, কেহ কালো এবং কেহ হয়েছে অন্য রংয়ের। তাদের মধ্যে খারাপও রয়েছে, পবিত্র রয়েছে এবং এর মাঝামাঝিও রয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ৪/৪০০; আবু দাউদ ৫/৬৭; তিরমিযী ৮/২৯০)

হযরত আদম (আঃ) কে যেভাবে সৃষ্টি করা শুরু হয়

আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আঃ) কে সৃষ্টির জন্য প্রথমে মাটির একটি বল তৈরি করেন; তখন সময়টি ছিলো শুত্রবার বাদ আছর। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজ হাতেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার কাজ শুরু করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি"। (সূরাহ ছোয়াদ, আঃ ৭৫)

হযরত আদম (আঃ) কে তৈরি করার মাটিটি ছিলো গন্ধযুক্ত পঁচাকাদা এবং পঁচা কাদা মাটিকে পানি মিশিয়ে ছেনে ছেনে আঠালো মাটিতে রুপান্তরিত করে নেয়। যেমন কুমাররা মাটির পাত্র তৈরির পূর্বে আঠালো মাটি তৈরি করে নেয়। আঠালো মাটি দিয়ে মানুষ তৈরির প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি হতে।" (সূরাহ ছফফাত, আঃ ১১)

অতঃপর, সেই আঠালো মাটির মানবদেহ তৈরি করে রেখে দিয়ে শুষ্ক ঠনঠন করা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কাঁদো মাটির শুষ্ক ঠনঠনা মাটি হতে"। (সূরাহ হিজর, আঃ ২৬)

অর্থাৎ, অত্র আয়াতের সাথে সেই আয়াতের কোন সংঘর্ষ নেই যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- "এবং তিনি কাঁদা হতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন" (সূরাহ সাজদা, আ: ৭)। কেননা, প্রথমে কাঁদা মাটি দিয়েই আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির সূচনা করেছেন, পরে সেই মাটিকে ছেনে আঠালো করেছেন তৎপর সেই মাটি দিয়ে মানবদেহ তৈরি করে শুকিয়ে ঠনঠনা করেছেন। আর সেই মানব দেহটি ছিলো ষাট হাত লম্বা। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আ:) কে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপর সৃষ্টি করেছেন, আর তা ষাট হাত। (ছহীহ্ বুখারী, হাঃ ১৬২০)

আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আঃ) এর দেহ তৈরি করে আদেশ প্রদান করলেন, হও ফলে সে চামড়া-গোস্ত সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "তিনি তাকে

মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তাকে বললো, হও; ফলে সে (চামড়া-গোস্ত সম্পূর্ণ মানুষ) হয়ে গেলো''। (সূরাহ আলে-ইমরান, আঃ ৫৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার ভিতর রূহ ফুঁকে দিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ''এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তার রূহ হতে''। (সূরাহ সাজদা, আঃ ০৯)

এখানে আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পদ্ধতির সাথে কুরআন মাজীদের ঐ আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- ''আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে'' (সূরাহ দাহর, আঃ ০২)।

কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- ''আর কাঁদা হতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন, অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে''। (সূরাহ সাজদা, আঃ ০৮)

অতএব পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যেই পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন সেই পদ্ধতির একটি প্যাকেজ মহান আল্লাহ তা'য়ালা তৈরি করেছেন। অর্থাৎ, পঁচা কাঁদা মাটি আঠালো মাটিতে রুপান্তরিত; আঠালো মাটিকে শুষ্ক ঠনঠনা মাটিতে রুপান্তর, সবশেষে মানবদেহে রুপান্তর এবং সেই মানবদেহে রক্ত, গোস্ত ও চামড়াতে পরিবেষ্টন। অতঃপর, তাতে রূহ প্রদান করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজ ক্ষমতা বলে একটি প্যাকেজ তৈরি করেছেন। যার নাম দিয়েছেন 'নুত্বফাহ্' তথা শুক্রবিন্দু বা শুক্রানু। আর সেই শুক্রাণুকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশের মেরুদন্ডের হাড়ের সঙ্গে নিপুণভাবে যুক্ত করেন। অতঃপর, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাতের অংশে, যা মূল জান্নাতের প্রধান ফটকের বাইরের এক অংশ বিশেষ, বিশাল বাগান বা জান্নাতে রাখেন। যেখানে হযরত আদম (আঃ) বসবাস করবেন। কিন্তু সেখানে তাঁর কোন নিজ জাতীয় সঙ্গী নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা করেন।

একদিন হযরত আদম (আঃ) নিদ্রাবস্থায় ছিলেন, এমন সময় আল্লাহ তা'য়ালা নিজ ক্ষমতা বলে হযরত আদম (আঃ) এর পাঁজরের একটি হাড় তথা হাড়ের উপাদান থেকে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে হযরত আদম (আঃ)-এর চিরসঙ্গিনী করে দেন। যেন হযরত আদম (আঃ) তাঁর সঙ্গলাভে শান্তি ও সুখ ভোগী হতে পারেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "হে মানুষগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন"। (সূরাহ নিসা, আ: ০১)

অতএব, নারী ও পুরুষের মিলিত পদ্ধতি তথা সংগমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা বহু নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন"। (সূরাহ নিসা, আঃ ০১)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আ:)-কে মানুষ জাতির প্রথম সৃষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ীই সৃষ্টি করেছেন, আর তা হতে মা হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু তারাই মানব জাতির সৃষ্টির শুরু, সেহেতু ব্যতিক্রম হিসেবেই 'মানুষ সৃষ্টি' পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব কৃষক ও জমিন যখন আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি সম্পূর্ণ করলেন তথা কৃষক হিসেবে হযরত আদম (আঃ) ও জমিন হিসেবে মা হাওয়া (আঃ) কে যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি সম্পূর্ণ করলেন; কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্র" (সূরাহ বাকারহ, আঃ ২২৩)। তখন জমিনে ফসল ফলানোর প্রক্রিয়া হিসেবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পুরুষদের মেরুদণ্ডের শেষাংশের হাঁড়, যাকে লাম্বার ভার্টিব্রা (lumbar vertebrae) বলা হয়, তাতে বীজভান্ডার হিসেবে মানুষ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সেই প্যাকেজটি তথা 'নুতফাহ্' নিপুনভাবে যুক্ত করেছেন। অতঃপর, মেরুদন্ডের বিশেষাংশ লাম্বার ভার্টিব্রা হয়ে যায় রূহহীন 'নুতফাহর' প্রথম বাসস্থান। নুতফাহ যদিও একটি পুরুষ শিশুর জন্ম থেকেই তার মেরুদন্ডের বিশেষ অংশ লাম্বার ভার্টিব্রা-তে অবস্থান করে, তবে তা সেই পুরুষ শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত খুবই পাতলা পানি হিসেবে সংযুক্ত হয়ে থাকে। আর এ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত

পর্যন্ত শুধু সে শক্তিই সঞ্চয় করে থাকে। অর্থাৎ, যদি পুরুষের প্রাপ্ত বয়স শুরু হয় ১৪-১৫ বছরে, সেই ১৪-১৫ বছর নুতফাহ্ শুধু 'রিজার্ভ শক্তি' প্রস্তুত করে।

আর পুরুষ যখন পানাহার করে সেই পানাহারের শক্তির বিশেষ নির্যাসটুকু নুতফাহ'র সেই রিজার্ভ শক্তিতে সঞ্চয় হতে থাকে। ফলে দিনে দিনে বিশেষ পানি আঠালো এবং মূল সাদা রঙয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে, একই সাথে সেই বিশেষ পানি বৃদ্ধি হতে থাকে। সেই পানিতে ভাসতে থাকে অসংখ্য 'নুতফাহ'। নুতফাহ গুলো সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে- ১. খুবই ক্ষুদ্র (নুতফাতুছ ছুগরা)। ২. খুবই ক্ষুদ্র থেকে একটু বড় (নুতফাতুল কুবরা), যা অন্যান্য 'নুতফাহ' থেকে হৃষ্ট-পুষ্ট ও চলাচল দ্রুতগামী। অর্থাৎ, পুরুষের মেরুদন্ডের হাড়ের বিশেষাংশ 'লাম্বার ভার্টিব্রা' অংশে মানবদেহ নুতফাহ্ রাখার প্রথম ও প্রধান স্থান।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন" (সূরাহ আরফ, আঃ ১৭২)। অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব থেকেই পুরুষদের মেরুদন্ডের হাড়ের সেই বিশেষাংশে "নুত্বফাহ"র মাযী (এক ধরণের পানি বিশেষ) সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যখনই সেই পুরুষ কোন হালাল ও উত্তম খাদ্য পানাহার করে, তখনই সেই মাযী দিনে দিনে বৃদ্ধি হতে থাকে ও একই সাথে সেই মাযীর সিংহভাগ আঠালো ও মূল সাদা রঙ এ রূপান্তরিত হতে থাকে। এখানে পানাহারের জন্য হালাল ও উত্তম খাদ্য শর্ত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত দেহ জাহান্নামের জ্বালানী হবে। আর উত্তম খাদ্য শর্ত করা হয়েছে তার একটি কারণ এই যে, কিছু কিছু খাদ্য আছে যা হালাল, কিন্তু ব্যক্তির শরীর অনুযায়ী তা অনুত্তম।

আবার কিছু কিছু খাবার আছে যা খেলে মাযীর উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই হবে। ফলে সেই ব্যক্তি যৌন রোগে আক্রান্ত হবে। ফলে যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তির বিবাহিত জীবনে অসুখী হয় এবং নেতৃত্বের ভার সংসারে পুরুষের হাতে না থেকে অধিকাংশ সময়ই স্ত্রীর হাতে চলে যায়। অথচ, আল্লাহ্ তা'য়ালা পুরুষের উপর নারীর

কতৃত্ব হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন- "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন" (সূরাহ নিসা, আঃ ৩৪)। সংসারে নারী নেতৃত্ব দ্বারা তথা স্বামী স্ত্রীর আনুগত্যের দরুন, সংসার হারাম পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং সেখানে শয়তান খুব সহজেই কুমন্ত্রণা দিতে পারে। যেমন- হারাম ইনকামের উৎসাহ প্রদান, কম ইনকামের জন্য ভর্ৎসনা ইত্যাদি। তৎপর তারা সকলেই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। যার কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে হালাল ও উত্তম পানাহারের আদেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (সূরাহ বাকারহ, আঃ ১৬৮)। মূল কথা, পানাহারের সাথে নুতফাহর মাযী উন্নীত হওয়ার বিষয়টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যেমন বৃষ্টির সঙ্গে জমিনের ফসলের, কৃষকের সঙ্গে জমিনের। তেমনি নুতফাহ'র মাযীর সাথে পানাহারের। পানাহারের মাধ্যমেই নুতফাহ'র মাযী সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি একাধারে কিছুদিন অনাহারে থাকলে সেই ব্যক্তি স্ত্রী সংগমে অক্ষম হয়ে পড়বে। যদিও সে কিছু দিন, কিছু সময় স্ত্রী সংগমে কিছু সক্ষম থাকতে পারে, তবে তা পূর্বের রিজার্ভ শক্তি সঞ্চয়ের কারণেই। অতঃপর, যেহেতু অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত রিজার্ভ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। সেহেতু প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই তার চিহ্ন সর্বপ্রথম স্বপ্নদোষের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর উক্তিটি ভালোভাবেই স্মরণ আছে; স্বপ্নদোষের পর পর ইয়াতিম নেই এবং সারা দিন রাত নীরব থাকাও নেই। অর্থাৎ, তার জন্তুদের মতো খাওয়া, ঘুম এবং মলত্যাগ নেই। তাকে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে হবে; যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার ৬ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২৮৬)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহি:) বলেন- প্রাপ্ত বয়সের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ প্রকারের পানি তীব্র বেগে বের হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার ৬ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃ:২৮৬) আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সমসাময়িক সময়েই এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাযী পুরুষাঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করে। সম্ভবত তা অন্ডকোষের বিচি হিসেবে পরিচিত। তবে পুরুষাঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে সর্বাবস্থায় মাযীর অবস্থান থাকে, কিন্তু সেই স্থানই যে প্রথম, প্রধান বা একমাত্র এমন ধারণা সঠিক হবে না। কারণ, কুরআন মাজীদ দ্বারা মাযীর প্রথম ও প্রধান স্থান প্রমাণিত হয় পুরুষের পৃষ্টদেশ যা লাম্বার ভার্টিব্রা হিসেবে পরিচিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ‘‘স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্টদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন’’। (সূরাহ আরফ, আঃ ১৭২)

সেই বিশেষ মাযীটা হলো এক প্রকারের বিশেষ পানি, যা আঠালো সাদা, আর সেই মাযীর সিংহভাগ আরো আঠালো ও গাঢ় সাদা। সেই অংশটুকে অসংখ্য নুতফাহ, আর সেই নুতফাহর- দুইটি প্রকারের একটি হলো খুবই ক্ষুদ্র; মাযীতে এই প্রকার নুতফাহ্ই অধিক। ২য় প্রকার নুতফাহ খুবই ক্ষুদ্র থেকে একটু বড়, যা অন্যান্য নুতফাহ্ থেকে হৃষ্ট-পুষ্ট ও চঞ্চল, দ্রুতগামী। যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। আর এই ২য় প্রকার নুতফাহ থেকেই সন্তান তৈরি হয়ে থাকে। মাযীর সেই সিংহভাগ অংশে প্রথম প্রকার নুতফাহ'র তুলনায় ২য় প্রকারে নুতফাহ্ খুবই কম থাকে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

যখন কোন পুরুষ লোক স্ত্রীলোকের সাথে সংগমে লিপ্ত হয়, তখন সেই নুতফাহ সমূহ পুরুষাঙ্গের মাধ্যমে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ‘‘আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি, মিলিত শুক্র বিন্দু হতে’’ (সূরাহ ইনসান, আঃ ০২)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তা হলো- ‘‘মিলিত শুক্রবিন্দু’’ অর্থাৎ পুরুষলোকের শুক্রানু ও স্ত্রীলোকের ডিম্বাণু মিলিত হয়ে-‘নুতফাতিন আমশাজ’ হয়েছে। অতএব, এটাও স্পষ্ট যে- পুরুষ লোকের যেমন নুতফাহ বা শুক্রানু আছে তেমন স্ত্রীলোকেরও

নুতফাহ্ বা ডিম্বাণু আছে। তবে পুরুষ নুতফাহ হলো ফসলের বীজ বপন করা আর স্ত্রী নুতফাহ হলো তা গ্রহণ করা এবং বীজের চারা উদগত হবার জন্য নুতফাহ উর্বর রাখা। অর্থাৎ হৃষ্ট-পুষ্ট, চঞ্চল ও দ্রুতগামী শুক্রানুগুলো পুরুষাঙ্গ থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে প্রথম প্রকারের শুক্রানু থেকে দ্রুতগতিতে স্ত্রীলিঙ্গের ডিম্বানুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। যদি ২য় প্রকারের একটি শুক্রানু স্ত্রীলোকের একটি ডিম্বাণুতে স্পর্শ করে, আর তখনই যদি স্ত্রীলিঙ্গে আল্লাহর আদেশে পরবর্তী শুক্রানু প্রবেশের পথে পর্দা নামিয়ে দেয় তথা একটি শুক্রানু ও একটি ডিম্বানু একত্রিত হওয়ার পর শুক্রানু ও ডিম্বানু উভয় উভয়ের আঘাতে ফেঁটে মিলিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর আদেশে পরবর্তী শুক্রানু প্রবেশের পথে পর্দা নামিয়ে দেয়; তথা ভিতরে অবস্থিত শুক্রানু আধারে পরিবেষ্টিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিশ্রিত শুক্র বিন্দুকে তথা নুতফাতিন আমশাজ থেকে সন্তান সৃষ্টি করেন। (আল্লাহু আকবার)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ‘‘আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর, স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে’’। (সূরাহ মুরছালাত, আঃ ২০-২১)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহি:) বলেন- শুক্র, যা তীব্র বেগে বের হয় এমন পানি, যা পুরুষের পৃষ্টদেশ হতে ও নারীর বক্ষদেশ হতে বের হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ মু'মিনূনের ১৪ নং আয়াতের আলোচনায়, খন্ড ৫ম, পৃঃ ৩২)

অতএব, পুরুষলোকের শুক্রানুর প্রথম নিরাপদ স্থান হলো স্ত্রীলোকের মধ্যবর্তী পুরুষ শুক্রানুকে নিয়ে। অতঃপর সেখান থেকে স্ত্রী ডিম্বানু মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়।

জানা প্রয়োজন: যদি পুরুষলিঙ্গের ২য় প্রকার নুতফাহ তথা শুক্রানুর একটি স্ত্রীর নুতফাহ তথা স্ত্রী শুক্রাণু বা ডিম্বানুতে স্পর্শ করে এবং শুক্রানু ও ডিম্বাণু আঘাত লেগে ফানা বা একাকার হয়ে যায়, তবে সেই মিলিত শুক্রানু থেকে বা নুতফাতীন আমশাজ থেকে একটি সন্তান জন্ম দেবে। আর যদি পুরুষলিঙ্গের ২য় প্রকারের একাধিক বা একের অধিক নুতফাহ স্ত্রীলিঙ্গের একাধিক বা একের অধিক নুতফাহ'তে আঘাত

করে বা উভয় নুতফাহ'ই একাকার হয়ে যায়, তবে সেই নুতফাহ সমূহ থেকে একের অধিক সন্তান হবে। যা জমজ সন্তান (দুজনই পুরুষ অথবা দুজনই নারী) জন্ম দেবে। অর্থাৎ, পুরুষলিঙ্গ থেকে ২য় প্রকারের নুতফাহ বা নুতফাতুল কুবরা যেমন একাধিক থাকে বা একাধিক দ্রুত গতিতে ছোটে, ঠিক তেমনিই স্ত্রীলিঙ্গ থেকেও একাধিক নুতফাহ্ আগন্তুক নুতফাহদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

আদম সন্তানের সৃষ্টি হয়েছে নুতফাহ্ হতে

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আঃ)-এর সন্তানদেরকে মিলিত নুতফাহ হতে সৃষ্টি করেছেন। মিলিত নুতফাহ তথা পুরুষ লোকের শুক্রাণু ও নারীলোকের শুক্রানু বা ডিম্বানু। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, পুরুষের বীর্যের রং সাদা ও গাঢ় হয় এবং নারীর বীর্যের রং হলদে ও তরল হয়। এ দুয়ের মধ্যে যা উপরে এসে যায়, তার উপরে সন্তান পুত্র ও কন্যা হয়ে থাকে এবং আকার ও অনুরূপতাও তার উপর নির্ভর করেই হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আলে ইমরানের ৯৩ নং আয়াতের আলোচনায়, খন্ডঃ ৪র্থ, পৃঃ ১১৯)

জানা প্রয়োজন: এমনও হয়ে থাকে যে, কোন কোন সময় উভয়ের বীর্যই কিছু করে ওপরে এসে থাকে, ফলে একই গর্ভে জমজ দুই সন্তান এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম নিয়ে থাকে। (আল্লাহ আকবার)। উল্লেখিত হাদীসের সঙ্গে সেই আয়াতের কোন সংঘাত নেই যেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন- "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সকল কিছু জানেন, সর্বশক্তিমান"। (সূরাহ শূরা, আঃ ৪৯-৫০)

কেননা পুত্র ও কন্যা দান হলো মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ক্ষমতা। যেহেতু তা আল্লাহর ক্ষমতা, সেহেতু নারী পুরুষের বীর্য উপরে বীর্য আসা বা নিচে নামা তাও মহান আল্লাহ তা'য়ালারই ইংগিতে হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান তিনি তা জানেন; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরাহ রাদ, আঃ ৮-৯)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতাসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি একটি মানব দেহেই (যখন তা মাতৃগর্ভে গঠিত করা হয় তখন) উভয় নুতফাহ তথা শুক্রানু ও ডিম্বানু যথাযথ স্থানে স্থাপন করতে পারেন। পরে তা কোন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভের প্রবেশের সক্ষমতা দান করেন এবং তা হতে সন্তান জন্ম লাভ করে থাকেন। যেমন মারিয়াম বিনতে ইমরান (আঃ) এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "মারিয়াম বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও না? সে (জিবরাইল আঃ) বললো- এরূপই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য"। (সূরাহ্ মারিয়াম, আঃ ২০-২১)

পিতা ব্যতীত মারিয়াম (আ:) এর সন্তান গ্রহণে তৎকালীন অনেক ইহুদি আলেমই অবিশ্বাস করে। একদিনের ঘটনা- বায়তুল মুকাদ্দাসের একজন আলেম যার নাম ছিল 'ইউসুফ নাজ্জার'। তিনি মারিয়াম (আঃ) এর আত্মীয়ও ছিলেন। মারিয়াম (আ:) এর গর্ভ যখন প্রকাশ পেয়ে গেল তখন ইউসুফ নাজ্জারের ভয়ানক সন্দেহের সৃষ্টি হলো কারণ, একদিকে অবিবাহিত নারীর গর্ভধারণ অন্যদিকে মারিয়ামের পাক-পবিত্রতা, দীনদারী, ইবাদত গুজারী ইত্যাদি। যা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রত্যেক খাদেমই ভালোভাবে অবগত ছিলেন। ভয়ানক সংশয় ও সমস্যার মধ্যে একদিন ইউসুফ নাজ্জার মারিয়াম (আঃ) কে বললেন- "হে মারিয়াম! আমি আপনাকে একটা কথা

জিজ্ঞেস করবো, তার উত্তর দানে তাড়াহুড়া না করে বিশেষ চিন্তা-বুদ্ধির দ্বারা উত্তর দিবেন।

মারিয়াম (আঃ) জিজ্ঞালা করলেন: সেই কথাটি কি?

ইউসুফ নাজ্জার বলল: দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ, বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মাতে পারে কি? পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হতে পারে কি?

মারিয়াম (আঃ) তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উত্তর দানে বললেন: আপনার প্রশ্ন, দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ এবং বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মাতে পারে কি? আমি বলি, আল্লাহর ক্ষমতাতে তা নিশ্চয়ই হতে পারে; আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম বৃক্ষ ও ফসলের গাছ দানা ও বীজ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছিলেন। আপনার প্রশ্ন পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হতে পারে কি? এটাও নিশ্চয়ই হতে পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম কে পিতা-মাতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছিলেন"।

ইউসুফ নাজ্জার মারিয়াম (আঃ)-এর উত্তরে পূর্ণ সন্তুষ্ট আস্থাবান হলেন এবং তাঁর সকল কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১১৬; তারিখ-ই-ইসলাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৮৮)

কুরআন মাজীদেও মহান আল্লাহ তায়ালা মারিয়াম (আ:) এর কথাটা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ।" (সূরাহ্ আলে ইমরান, আঃ ৫৯)

অতএব, ব্যতিক্রমী হিসেবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একটি মানবদেহে উভয় প্রকার নুতফাহ দান করতে সক্ষম, এটা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ক্ষমতা সমূহের একটি। তবে একথাও স্পষ্ট যে, সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিকে অবশ্যই অবশ্যই দ্বীনদার ও তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তি হতে হবে যার ব্যাপারে এমন ব্যভিচারের সম্ভাবনা নেই। যেমন- ইউসুফ নাজ্জার চিন্তায় পড়েছিলেন মারিয়ামের দ্বীনদারি, তাকওয়া ও ইবাদত গুজারী দেখে এবং মারিয়াম (আঃ) এর গর্ভে পিতা ব্যতীত সন্তান দেখে। জানা প্রয়োজন যে, ঈসা (আঃ)-এর পরে পিতা ব্যতীত পুত্র জন্ম নেবেন কি? নাকি নেবেন না? - এটা আল্লাহ্ তায়ালাই অধিক জানেন।

আমার আলোচনার মূল বিষয় হলো আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে, একটি মানবদেহে উভয় প্রকার নুতফাহ দান করে তাতে সন্তান দান করতে পারেন। এতে বর্তমান সায়েন্স সমর্থন দিলেও; না দিলেও। কিন্তু তা খুবই ব্যতিক্রম।

তা ব্যতীত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হল- উভয় নুতফাহ বা শুক্র হতে আল্লাহ তা'য়ালা আদম সন্তান সৃষ্টি করেন। আর তা করেন মিলিত শুক্রাণুকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাতৃগর্ভে নিরাপদ আধারে দিয়ে যা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- ‘‘অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি, এক নিরাপদ আধারে’’। (সূরাহ মু'মিনুন, আঃ ১৩)

অতঃপর, আল্লাহ তা'য়ালা সেই শুক্রবিন্দুকে পরিণত করেন আলাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-‘‘পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে’’ (সূরাহ মু'মিনুন, আঃ ১৪)। আলাক হলো- লাল রংয়ের একটি লম্বা 'রক্তপিন্ড'। যা মিলিত শুক্রাণু হতে রূপান্তরিত হয়ে ৪০ দিনে লাল রংয়ের একটি লম্বা রক্তপিন্ডে পরিণত হয়।

আর সেই আলাককে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ‘মুদ্বগোহ্’ তে পরিণত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- ‘‘অতঃপর আলাককে পরিণত করি মুদ্বগোহ্ তে’’ (সূরাহ মু'মিনুন, আ: ১৪)। মুদ্বগোহ হলো- গোস্ত, পিন্ড। যা লম্বা, রক্তপিন্ড থেকে রূপান্তরিত হয়ে ৪০ দিনে গোস্ত পিন্ডে পরিণত হয়।

তৎপর সেই মুদ্বগোহ্ কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ‘ই'জ্বোমা’ তে পরিণত করেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ‘‘এবং, গোস্ত পিন্ডকে পরিণত করি ই'জ্বোমা তে’’ (সূরাহ্ মু'মিনুন, আ: ১৪)। ই'জ্বোমা হলো- অস্থি। তথা মাথা, হাত, পা, হাড়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই গোস্ত পিন্ডকে ৪০ দিনে অস্থি তৈরি করেন। (আল্লাহু আকবর) অতঃপর, মহান আল্লাহ তা'য়ালা অস্থিকে গোস্ত দ্বারা ঢেকে দেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- ‘‘অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোস্ত দ্বারা। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য একটি সৃষ্টিরূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান’’। (সূরাহ মু'মিনুন, আঃ ১৪)

ইবনে কাসীর (রহি:) বলেন, অত্র আয়াতের আয়াতাংশের ভাবার্থ হলো- অতঃপর আমি গোস্ত দ্বারা ঢেকে দেই, যেন তা গুপ্ত ও দৃঢ় থাকে। ইবনে কাসীর (রহি:) বলেন- এরপর আল্লাহ তা'য়ালা তাতে ফুঁকে দেন, যাতে সে নড়া-চড়া করা ও চলা-ফেরা করার যোগ্য হয়ে ওঠে। ঐ সময় সে জীবন্ত মানুষরূপ ধারণ করে। সে দেখার, শোনার, বুঝার, নড়ার এবং স্থীর থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ্ মু'মিনূনের ১৪ নং আয়াতের আলোচনায়, খন্ড ৫ম, পৃঃ ৩৩)

অতএব, মহান আল্লাহ তা'য়ালা দুর্গন্ধ মিশ্রিত নুতফাহ থেকে মানুষ সৃষ্টি করে তাতে রূপদান করেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তারই সকল উত্তম নাম।" (সূরাহ্ হাশর, আ: ২৪)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে"। (সূরাহ ত্বীন, আ: ৪)

মাতৃগর্ভে সন্তানের আকার রূপান্তরিত প্রাসঙ্গিক এক হাদিসে বর্ণিত- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, সত্যবাদী ও সত্যায়িত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন- "তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি শুক্রের মাধ্যমে তার মায়ের পেটে ৪০ দিন পর্যন্ত জমা থাকে। তারপর তা ৪০ দিন রক্তপিন্ডের আকারে থাকে। এরপর ৪০ দিন পর্যন্ত গোস্তপিন্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা একজন ফিরিশতাকে পাঠিয়ে দেন, যিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং আল্লাহর আদেশক্রমে চারটি বিষয় লিখে দেন তা হলো- তার রিযক, আয়ুকাল, আমাল এবং সে হতভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান হবে"। (মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮২; ছহীহ্ মুসলিম ৪/২০৩৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ্ মু'মিনূনের ১৪ নং আয়াতের আলোচনায়, খন্ড ৫ম, পৃঃ ৩৩)

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মাতৃগর্ভের অস্থিকে গোস্ত দ্বারা ঢেকে দেন তার অস্থি গুপ্ত ও দৃঢ় রাখার জন্য। সেই অবস্থাতেই একজন ফিরিশতাকে পাঠিয়ে মাতৃগর্ভের শিশুর মধ্যে রুহ ফুঁকে দেন এবং একই সাথে উল্লেখিত ৪টি বিষয় লিখে দেন।

<u>জানা প্রয়োজন:</u> ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে যার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশেও মাতৃগর্ভ থেকে শিশু জন্মানোর ৭ দিনের মাথায় পরিবারের লোক শিশুকে বিছানায় বা দোলনায় শায়িত অবস্থায় রেখে সেই শিশুর পাশে একটি খাতা ও একটি কলম রেখে দেয় এই বিশ্বাসে যে-সেইদিন শিশুর ভালো মন্দ লেখা হবে। শিশুকে শিক্ষিত করতে হলে, তার পাশে খাতা-কলম রেখে দিলে সেই বিষয়টিও লিখে দিয়ে যাবে। এমন কর্ম বিদআত এবং কুসংস্কার যা কুফরের জন্ম দেয়। কারণ, শিশুর তাকদিরের ভালো-মন্দ তার মাতৃগর্ভে ১২০ দিনের পরপরই লেখা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা শিশুকে তার মাতৃগর্ভে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখেন

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দু হতে লম্বা রক্তপিন্ডে রুপান্তরিত করেন, তৎপর রক্তপিন্ড হতে গোস্ত পিন্ডতে রূপান্তরিত করেন, তৎপর তা অস্থিতে রুপান্তরিত করেন, তৎপর সেই অস্থি সুদৃঢ় রাখার জন্য ও অস্থি গুপ্ত রাখার জন্য অস্থিকে গোস্ত দ্বারা ঢেকে দেন। তৎপর তাতে রূহ ফুঁকে দিয়ে উত্তম গঠনে একটি শিশুতে রূপান্তরিত করেন। (আল্লাহু আকবার)

তৎপর মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মাতৃগর্ভে সেই শিশুকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত রাখেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিত ভাবে, আমি কত নিপুন স্রষ্টা"। (সূরাহ্ মুরছালাত, আঃ ২২-২৩)

মাতৃগর্ভের এই নির্দিষ্ট সময়টি জননীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর একটি সময়। আর এজন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পিতা-মাতার সাথে সন্তানকে সদ্ব্যবহারের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "তোমাদের প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে"। (সূরাহ বানী ইসরাইল, আঃ ২৩)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- "সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট"। (সূরাহ লুকমান, আঃ ১৪)

আর তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কারণও মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে"। (সূরাহ আহকাফ, আ: ১৫)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিঃ) উক্ত আয়াতাংশের আলোচনায় বলেন, সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন- মুর্ছা যাওয়া, শারীরিক দুবর্লতা, বমি হওয়া, শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, শরীরের অবক্ষয় ইত্যাদি নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের সম্মুখীন মাকেই হতে হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ্ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ৬৮৩) এভাবেই একটি শিশু তার মাতৃগর্ভে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করে। এই নির্দিষ্ট সময়ের সর্বনিম্ন সময়সীমা হলো ৬ মাস।

হযরত বাযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তার গোত্রের একটি লোক জুহনিয়্যাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করে। ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই মহিলাটি সন্তান প্রসব করে। তখন- তার স্বামী খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান (রাঃ) এর নিকট তার ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। উসমান (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে আসতে উদ্যত হলে তার বোন কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মহিলাটি তখন তার বোনকে সান্তনা দিয়ে বলে- তুমি কাঁদছো কেন? আল্লাহর শপথ! আমার স্বামী ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের সাথেও আমি কখনও মিলিত হইনি। আমার দ্বারা কখনও কোন দুষ্কর্ম হয়নি। সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি ফয়সালা হচ্ছে তা তুমি সত্ত্বরই দেখে নিবে। মহিলাটি উসমান (রাঃ) এর নিকট হাজির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর) মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। এ খবর আলী (রাঃ) এর কর্ণগোচর হলে তিনি খলিফাতুল

মুসলিমীন (রাঃ) কে প্রশ্ন করেনঃ আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেনঃ এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই সন্তান প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার আদেশ দিয়েছি)। আলী (রাঃ) তখন তাকে বলেন- "আপনি কি কুরআন পড়েননি? উত্তরে তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছি। আলী (রা:) তখন বলেন তাহলে কুরআনুল হাকীমের "ওয়া হামলুহু ওয়া ফিদ্বোলুহু সালা-সূনা শাহরো" অর্থঃ তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশমাস (সূরাহ্ আহ্কাফ, আ: ১৫)। এ আয়াতটি এবং "হাওলাইনি কা-মিলাইনি" - অর্থঃ দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো পূর্ণ দুই বছর। এ আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময় কাল হলো ত্রিশ মাস। এর মধ্যে দুধ পান করানোর সময় কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস। বাদ গেলে বাকী থাকে ছয় মাস। তাহলে কুরআনুল কারীম দ্বারা জানা গেলো যে গর্ভধারণের সময়কাল হলো কম পক্ষে ছয় মাস। এ মহিলাটি সময়কালের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার উপর কি করে ব্যাভিচারের অভিযোগ দেয়া যেতে পারে? এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন- আল্লাহর শপথ! এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি। যাও, মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। মুআম্মার (রহিঃ) বলেন- আল্লাহর শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার সাদৃশ্য এর চেয়েও বেশি ছিলো। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলেঃ আল্লাহর শপথ! এটা যে, আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা মহিলাটির স্বামীর মুখমন্ডলে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন, যা তার চেহারায় দেখা দিয়েছিলো। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৮৪-৬৮৫)

ইমাম ইবনে কাসীর (রাহিঃ) বলেন- তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস (সূরাহ আহকাফ, আঃ ১৫)। এই আয়াতসহ পরবর্তী দুটি আয়াতের মাধ্যমে আলী (রাঃ) প্রমাণ সাব্যস্ত করতেন যে, কোন মহিলার গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে ছয় মাস। পরবর্তী আয়াত দুটি হলো- আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ‘‘এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে’’ (সূরাহ্ লুকমান, আঃ ১৪)। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘এবং যদি কেউ স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জননীগণ পূণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে’’। (সূরাহ্ বাকারহ, আঃ ২৩৩)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিঃ) আরো বলেন যে, আলী (রাঃ)-এর এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক। উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এই দলীলের দৃঢ় সমর্থন দিয়েছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৬৮৩-৬৮৪)

অতঃপর সন্তান প্রসবের শেষ সময় দুই বছর। অর্থাৎ সন্তান দীর্ঘ দুই বছর তার জননীর গর্ভে থাকতে পারে। যেমন- হযরত যাহহাক (রহিঃ) বলেন, আমি মাতৃগর্ভে দীর্ঘ দুই বছর ছিলাম তাতে আমার চুলও বড় হয়ে গিয়েছিলো এবং দাতঁও উঠেছিলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

অতএব, ছয় মাসে সন্তান জন্ম নিলে তাতেও অপবাদের কিছুই নেই এবং সন্তান ৯ মাস, ১০ মাস, এমনকি ২০ মাসে জন্ম নিলেও সিজার করার প্রয়োজন নেই। তবে যেহেতু বর্তমান সময়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের নড়াচড়া দেখার সুযোগ সুবিধা আছে সেহেতু কেউ তাঁ দেখলে অপরাধ নেই।

তবে সিজার করাটা দোষনীয়। কারণ, এতে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা কমে যায়। সন্তান মাতৃগর্ভে আসার শুরুতেই পিতা-মাতা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় যে, সন্তান পেটে যদি নরমাল ভাবে না হয়ে সিজার করা লাগে, তাহলে অনেক টাকা লাগবে। ফলে তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় সন্তান প্রসবের জন্য আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে

সিজারের প্রতি নির্ভরশীলতা। দুবর্লমনা স্ত্রীলোকদের মনে এমন চিন্তাও চলে আসে যে, সিজার করাটা তার জন্য অনেক কষ্টকর। না জানি কি হয়?

ফলে সেই নারী শারীরিক ও মানসিক ভাবে আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রসব বেদনায় সে হতাশ হয়ে যায়, ফলে সিজারই তার মূল সমাধান হয়ে দাঁড়ায়। সন্তান প্রসবের সময় অনেক কষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তার জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে"।(সূরাহ আহকাফ, আঃ ১৫)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিঃ) বলেন- যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হয় তখনও প্রসব বেদনা, খিচুনীসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয় জননীকে (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ৬৮৩)। সিজার করার বিন্দু পরিমাণও উপকার নেই অথচ তার রয়েছে অসংখ্য ক্ষতি। তবে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের সময় সিজার করা, বর্তমান সময়ে শতভাগ জরুরি হয়ে গেছে। সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক হলো তারা যারা imcon (ইমকন) খায়, ইমার্জেন্সি সন্তান নিয়ন্ত্রক ঔষধ হিসেবে আর মাসিক ভিত্তিতে খায় সন্তান নিয়ন্ত্রক ঔষধ-সুখি বা মায়া বড়ি, ফেমিকন-(Famicon), অভোস্টেট (Avostet) ইত্যাদি। কারণ, সেই সকল বিষক্রিয়াযুক্ত ঔষধগুলো মানুষের জন্য খুবই ভয়াবহ। যদিও পরিবার পরিকল্পনার মাঠ কর্মীরা মানুষকে সেই ঔষধগুলোর শুধু সফলতার মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে থাকে। অথচ, সেই ঔষধগুলোর মারাত্মক ভয়াবহতার কথা ভুলক্রমেও বলে না তারা। কারণ, এই ঔষধগুলো ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরই একটি ঘৃণিত চক্রান্ত। আল্লাহ্ তা থেকে মুসলমানদের হিফাজাত করুন, আমিন। মূল কথা, মায়ের সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট হলেও তা সহ্য করা অতি উত্তম। এতে মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

যেমন অবস্থাতে গর্ভবতী স্ত্রী লোকের সিজার করা জরুরী

গর্ভবতী নারীদের সিজার করা ইসলাম সমর্থন দেয় না। কারণ সিজার করা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে একটি মাত্র কারণে গর্ভবতী নারীর সিজার করা জরুরী। আর তা হলো-

যখন কোন গর্ভবতী নারী গর্ভে সন্তান জীবিত রেখে ইন্তিকাল করবেন, তখন সেই গর্ভবতী মৃত নারীর পেট সিজার করে জীবিত শিশুকে বের করা যাবে। আর সেই অবস্থায় মৃত গর্ভবতী নারীর পেট সিজার করা জরুরী। আর এই জরুরী সিজার পদ্ধতি চালু হয়েছে প্রায় ২ শত হিজরীর দিকে। তবে সঠিক সময় পাওয়া যায় ২৩৮ হিজরীর ১০/২২ রবিউল আওয়াল মাসে ইমাম জাফর ত্বহাবী (রাহিঃ)-এর জন্ম সময়ে। ইমাম ত্বহাবী (রহিঃ) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাত্রেই তাঁর জননী ইন্তিকাল করেন। এমতাবস্থায় ইমাম ত্বহাবী (রহিঃ)-কে তার মৃত জননীর পেট সিজার করে বের করা হয়। যা অধিক উত্তম ও যুক্তিসংগত একটি পদ্ধতি। ইমাম ত্বহাবী (রহিঃ)-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন কোনো মাসয়ালা যুক্তি সংগত হবে না যে, জীবিত নারীরও পেট সিজার করা যাবে; এমন ফতুয়া প্রদান ভুল হবে।

মাতৃগর্ভ থেকে মানুষদের শিশুরূপে জন্ম

মাতৃগর্ভে সন্তানের বিভিন্ন পরিবর্তনের পর মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে বের করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তারপর তোমাদেরকে মায়ের পেট হতে বের করেন শিশু- রূপে"। (সূরাহ মু'মিন, আঃ ৬৭)

একটি বিষয় জেনে রাখতে হবে যে, মাতৃগর্ভে বিভিন্ন রুপে রূপান্তরিত হওয়া এই শিশুর স্বাভাবিক নিয়ম হলো যে, সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে যৌবনে যাবে অতঃপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হবে। তবে প্রতিটি জিনিসের মতোই মাতৃগর্ভে বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হওয়া এই শিশুগুলোর ব্যতিক্রম কিছু আছে। তা হলো কোন কোন শিশু মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। আবার কোন কোন শিশু মাতৃগর্ভে সম্পূর্ণ শিশু

রূপে গঠন হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেক শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেক শিশু জন্ম লাভেরও অনেক পরে এবং যৌবনে পৌঁছার অনেক পূর্বেও মৃত্যুবরণ করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘‘অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আবার তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই’’। (সূরাহ মু’মিন, আ: ৬৭)

অতঃপর যখন কোন শিশু জন্ম নেয়; তখন সে ইসলামের ফিতরতের উপর জন্ম নেয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক শিশুই ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি করে, খ্রিস্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন: ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষ মুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু মানুষরাই তার কান ইত্যাদি কেটে নিয়ে তাকে দোষ যুক্ত করে থাকে। (ছহীহ বুখারী **১৩৫৮**; ছহীহ মুসলিম **২৬৫৮**, **৬৬৪৮**; আহমাদ **৭১৮১**; ইরওয়া **১২২০**; সহীহ আল জামি‘ **৫৭৮৪**; সহীহ ইবনু হিব্বান **১২৯**; তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার **১১৯** নং আয়াতের আলোচনায়, পৃ: ৫৭০)

অন্য এক হাদিসে আছে, হযরত আইয়ায ইবনে হাম্মদ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘‘আমি আমার বান্দাকে একমুখী দ্বীন ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান এসে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে’’। (ছহীহ মুসলিম **২৮৬৫**; তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার **১১৯** নং আয়াতের আলোচনায়, পৃ: **৫৭০**; তাফসীরে আহসানুল বায়ান, সূরাহ বাকারহ এর **১৬৮** নং আয়াতের)

রিজিকদাতা মহান আল্লাহ তাআলা

যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাদের এবং তাদের প্রয়োজনে যত জীব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাদের সকলেরই রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন- ‘‘ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই, তিনি তাদের স্থায়ী অস্থায়ী উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে’’। (সূরাহ হুদ, আঃ ০৬)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন- ‘‘আল্লাহই তো রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত’’। (সূরাহ যারিআত, আঃ ৫৮)

মহান আল্লাহ তায়ালাই বস্ত্র দানকারী

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যেমন রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তেমনি ভাবে তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য বা ছতর ঢাকার জন্য লিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘‘হে আদম সন্তান, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছেদ দিয়েছি’’। (সূরাহ আরাফ, আঃ ২৬)

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করার পর শুধু তাদেরকে রিযিক এবং লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য বস্ত্রই দিয়েছেন তা নয়; বরং বান্দার প্রতিটি বয়সের ধাপে ধাপে আল্লাহ বান্দাকে অনুগ্রহ করেছেন। বান্দার বয়সের প্রতিটি ধাপে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ:-

প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বান্দার গুনাহ লিপিবদ্ধকরণ বন্ধ থাকে

বান্দাহ প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বান্দার গুনাহ লিপিবদ্ধকরণ বন্ধ থাকে। এই অবস্থাতে বান্দা মৃত্যুবরণ করলে সে ইসলামেরই উপর মৃত্যুবরণ করবে। হোক সে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইয়াহুদি কিংবা মাজুসীর ঔরসে জন্মগ্রহণকারী।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি করে, খ্রিস্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষ মুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু মানুষরাই তার কান ইত্যাদি কেটে নিয়ে তাকে দোষ যুক্ত করে থাকে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার ১১৯ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃ: ৫৭০; ছহীহ বুখারী ১৩৫৮; ছহীহ মুসলিম ২৬৫৮, ৬৬৪৮;

আর প্রাপ্তবয়স্কদের সময় সম্পর্কেও ইসলাম উল্লেখ করেছে। হাদিসে বর্ণিত আছে তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যথা:

১। শিশু; যে পর্যন্ত না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

২। ঘুমন্ত ব্যক্তি; যে পর্যন্ত না সে জেগে ওঠে।

৩। পাগল ব্যক্তি; যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার ৫ নং আয়াতের আলোচনা, পৃ: ২৮৬)

আর শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক হতে বা প্রাপ্তবয়স্ক শুরু হয় তার ১৫ বছর থেকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, উহুদের যুদ্ধে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে সঙ্গে নেননি। তখন আমার বয়স ছিল ১৪ বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ)এর নিকট হাযির করা হলে তিনি সম্মত হন। সে সময় আমার বয়স ছিল ১৫ বছর।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহি:) এর নিকট এ হাদিসটি পৌছলে তিনি বলেন- প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা এটাই। (তাফসিরে ইবনে কাসীর, সূরাহ নিসার ৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃ: ২৮৬)

জানা প্রয়োজনঃ পনেরো বছর বয়সে বান্দার প্রাপ্ত বয়স শুরু হয় কাজেই যাবতীয় ফরয বিধান তার প্রতি ফরয হয়ে যায়। তবে যদি সে পিতৃহীন হয়ে থাকে তবে তার

শর্ত হলো ১৫ বছর বয়স অথবা গুপ্তস্থানে লোম গজানো থেকে শুরু করে তার ইসলামী মেধার উপর, তথা যদি তার ইসলামের মেধা থাকে সেই মেধার উপর ভিত্তি করে তাকে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বুঝিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন- ‘‘এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দিবে’’। (সূরাহ নিসা, আঃ ০৬)

আর এই ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাগণকে তিন সময় দিয়ে থাকে। যথা:

১। কুরআন-হাদিস অর্থ বুঝে পড়া ও তার প্রতি চিন্তা-গবেষণা।

২। বিবাহের মাধ্যমে।

৩। ৪০ বছর বয়স পূর্ণ হলে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির ১৫ বছর বয়স অতিক্রম করার পরেও তাকে তার সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না; যতক্ষণ সে ইসলামের জ্ঞানে ভালো-মন্দ বিচার করতে না পারে।

অতঃপর যদি সে তা না পারে তবে সে তার ২৫ বছর বয়সে উপনীত হলে যদি সে পাগল ব্যক্তি না হয়; তবে তাকে তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে হবে। কেননা,

কারণ ১:- ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের শারীরিক গঠন ও আবহাওয়া অনুযায়ী ২৫ বছর বয়সে বিবাহ করাই উত্তম সময়। যদি সে ওই সময় বিয়ে নাও করে তবুও তাকে সে সম্পদ বুঝিয়ে দিতে হবে।

কারণ ২:- এই ২৫ বছর বয়সই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের যৌবনের মধ্যকার বয়স। তাছাড়া ২৫ বছরকেই মানুষের জীবনের এক যুগ ধরা যায়।

কারণ ৩:- ভারতীয় উপমহাদেশের সন্তানদের ১৫ বছর বয়সেও পিতৃহারা হলে তাকেও ইয়াতিম বলা যায়। কারণ একজন পিতাহারা পুত্র-কন্যাকে এ কারণে ইয়াতিম বলা হয়ে থাকে যে, তার নিজের ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান না হতেই তারা

পিতাহারা হয়ে যায়। ফলে সে নিজের সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনা এবং সঠিকভাবে বিনা বাঁধায় নিজের জীবনও পরিচালনা করতে পারে না।

অতএব যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ সন্তানরাই ১৫/১৬ বছরে নিজের সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত তার নিজের ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞানও তার থাকে না। আর তার পিতা-মাতা তাকে ১৫/১৬ বছর বয়সে তাকে একা ছেড়ে দিলে বা আঞ্চলিক ভাষায় ভাগ-বায়টি (বাটোয়ারা) বা আলাদা করে দিলে সেই ১৫/১৬ বছরের সন্তান তার ঈমান-আমল ও দুনিয়াবী সম্পদও হেফাজত করতে সক্ষম হবে না। বরং তার সেই উঠতি যৌবনের গুনাহের ভার পিতা-মাতার উপর বর্তায়। যেমন, একজন ১৭ বছরের ছেলে ও ১৭ বছরের মেয়ে পিতা-মাতার পক্ষ থেকে শাসন না থাকার কারণে যদি তারা যিনায় লিপ্ত হয় তবে সেই পিতা-মাতার দায়িত্বহীনতার কারণে তারাও গুনাহগার হবে। আর যদি ১৬/১৭ বছরের সন্তান সম্পদের সঠিক ব্যবহার নীতি না বুঝে খেল-তামাশায় সম্পদ নষ্ট করে দেয় অতঃপর সন্তান বিপদগ্রস্ত হয়; তবে তার পিতা-মাতাও সেই বিপদের মধ্যে পতিত হয়।

অতঃপর ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ২৫ বছর বয়সেই বিবাহের ও সম্পদ হেফাজতের উত্তম সময়। অতঃপর কেউ যদি ২৫ বছরের পূর্বেই বিবাহ করে তবে তা ভালো বিষয়; দোষণীয় নয়। বরং সে তার সম্পদ পেয়ে যাবে। কারণ, তার বিবাহের সাথে তার সম্পদও ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত রেখেছে ইসলাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন- "ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের যোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দিবে"। (সূরাহ নিসা, আঃ ০৬)

বান্দার ৪০ বছর হলে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ

৪০ বছর বয়স মানুষের জন্য একটি কল্যাণকর বয়স। এই বয়সেই মহান আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ (ﷺ) সহ অনেক নবী-রসূল (আ:) গণকে নবুয়ত ও রিসালাত দান করেছেন। এই ৪০ বছর বয়স সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে। তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং ৪০ বছরে উপনীত হয় তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’’। (সূরাহ আহকাফ, আঃ ১৫)

অর্থাৎ, ৪০ বছর বয়স মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার মহাঅনুগ্রহ প্রাপ্তির বয়স। হাজ্জাজ ইবনে আব্দুল্লাহ্ হালিমী; যিনি দামেশকে বনী উমাইয়ার গভর্নর ছিলেন, তিনি বলেন যে, আমি চল্লিশ বছর বয়সে লোক লজ্জায় গুনাহ ছেড়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর, আল্লাহর লজ্জায় গুনাহ্ ত্যাগ করেছি। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২১৭)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহিঃ) বলেন- প্রবাদ আছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস সৃষ্টি হয় অবশিষ্ট জীবনে তা তেমন পরিবর্তন হয় না। আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহিঃ) কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান (রহিঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি মাসরুক (রহিঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুষকে কখন পাপের জন্য পাকড়াও করা হয়? উত্তরে তিনি বললেন, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে। অতএব, তুমি

তোমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নাও। (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরাহ্ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২১৬)

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসলমান যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তার হিসাব হালকা করে দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২১৬)

বান্দার ৬০ বছর বয়স হলে আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ

মহান আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি অতি দয়ালু যদিও বান্দার অপরাধের কারণে তাঁর শাস্তি প্রদানের অধিকার ও ক্ষমতা আছে। তবুও তিনি বান্দার প্রতি ভালোবাসা দেখানোকেই অধিক পছন্দ করেন। আর বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যতম একটি দয়া হলো ষাট বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরেও অনেক মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা আল্লাহমুখী হওয়ার তাওফীক দান করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসলমান যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তার হিসাব হালকা করে দেন। আর যখন ৬০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাকে আল্লাহমুখী হওয়ার তাওফীক দান করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকাফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃষ্ঠা: ২১৬)

এখানে একটি বিষয় হলো- যেই সকল বান্দারা ষাট বছর বয়সেও উপনীত হয়ে আল্লাহমুখী হওয়ার চেষ্টা না করে দুনিয়ামুখীই থাকবে এবং গুনাহের কাজ করতে থাকবে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের পাপের পথে চলাই সহজ করে দেন। পরবর্তীতে তাকে হিদায়াতশূন্য হিসেবে মৃত্যু দান করেন। ফলে সে ঘৃণিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুর পর শাস্তির সম্মুখীন হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- "সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সহজ করে দিবো সঠিক পথ এবং কেউ কার্পন্য করলে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম অস্বীকার করলে, আমি তার জন্য সহজ করে দিবো কঠোর পথ বা ভ্রষ্ট পথ এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে"। (সূরাহ লাইল, আ: ৫-১১)

বান্দাহ ৭০ বছর বয়সে উপনীত হলে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

বান্দাহ যখন পূর্বের বয়সগুলো অতিক্রম করে ৭০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন সেই বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আরো বেড়ে যায় এবং তাকে দুনিয়াতেই জান্নাতবাসী হওয়ার কিছু আলামত দান করে থাকেন।

অতঃপর আসমানের ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ করে দেন ৭০ বছর বয়সী বান্দাকে ভালোবাসার জন্য। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসলিম যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তার হিসাব হালকা করে দেন। যখন ৬০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাকে আল্লাহমুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন ৭০ বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২১৬)

আর যদি কেউ ৭০ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরেও আল্লাহমুখী না হয়, তবে আকাশের অধিবাসীরা তার প্রতি ঘৃণা শুরু করে।

বান্দাহ ৮০ বছর বয়সে উপনীত হলে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

বান্দাহ্ ৮০ বছর বয়সে উপনীত হলে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই ৮০ বছর বয়সের বান্দার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ দুনিয়ায় একটি বড় পুরষ্কার দান করেন। আর সেই পুরষ্কার হলো- ৮০ বছর বয়সের আল্লাহমুখী সেই মুসলিম বান্দার সৎকর্মগুলো আল্লাহ তার আমাল নামায় অটুট করে রাখেন আর অপকর্মগুলো সব মুছে দেন। (সুবহান আল্লাহ্)

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসলমান যখন ৪০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার হিসাব হালকা করে দেন। যখন ৬০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাকে আল্লাহমুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন ৭০ বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু

করে। যখন ৮০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার সৎকর্মগুলো অটল রাখেন আর মন্দকর্মগুলো মুছে দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আহকফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২১৬)

বান্দাহ ৯০ বছর বয়সে উপনীত হলে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহমুখী মুসলিম বান্দার জন্য ৯০ বছর বয়সটি দুনিয়ায় বুকে সৌভাগ্যময় বছর। কারণ, ৯০ বছর বয়সী আল্লাহমুখী মুসলিম বান্দাহ স্বয়ং মহান আল্লাহ তায়ালার মেহমান হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করেন। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন- আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মুসলমান যখন ৪০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার হিসাব হালকা করে দেন। যখন ৬০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাকে আল্লাহমুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন ৭০ বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। যখন ৮০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার সৎকর্মগুলো অটল রাখেন আর মন্দকর্মগুলো মুছে দেন। আর যখন ৯০ বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এবং তার পরিবারের লোকদের জন্য তাকে সুপারিশকারী নিয়োগ করেন এবং আকাশে এই কথা লিখে রাখেন যে, এই ব্যক্তিটি পৃথিবীতে আল্লাহর মেহমান। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরাহ আহ্কফের ১৫ নং আয়াতের আলোচনায়, পৃঃ ২১৬)

এখন একটি বার গভীরভাবে ভেবে দেখুন- বার্ধক্য উপনীত ব্যক্তিগণ দুনিয়ায় বসবাসরত জ্ঞানহীন, আল্লাহবিমুখী পরিবারের লোকদের নিকট এক প্রকার বোঝা হয়ে থাকে। কারণ, এই বয়সে তাদের বিভিন্ন প্রকারের অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থাতে নতুন নতুন ব্যাধি দেখা দেয়। চলাচল শক্তি কম হওয়ার কারণে রাগ বেড়ে যায়, শিশুদের মতো বিভিন্ন খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। সাধারণত সকালের কথা বিকেলেই ভুলে যায়। কাজেই এমন ব্যক্তিদের জ্ঞানহীন ও আল্লাহ বিমুখী পরিবারের লোকদের নিকট এক প্রকার বিরক্তির কারণ

হতে হয়। সে জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলা তার সম্মানকে দুনিয়াতে অটুট রাখার জন্য এবং পরিবারের লোকদের নিকট তার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য তাকে দুনিয়ায় তিনটি পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করেন-

১। তিনি নিষ্পাপ।

২। তিনি পরিবারের লোকদের জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী।

৩। তিনি দুনিয়ায় থেকে মহান আল্লাহর মেহমান। অর্থাৎ কোনো আল্লাহমুখী মুসলিম পরিবারের লোকগণ যখন সেই ৯০ বছর অতিক্রমকারী বৃদ্ধ মুসলিমের এই তিনটি বড় পুরষ্কার সম্পর্কে অবগত হবে, তখন এমনিতেই সেই বৃদ্ধ মুসলিমের সেবা-যত্নের প্রতি গুরুত্ব দেবে।

যদি সেই পরিবারের সদস্যগণ নিতান্তই হতভাগা না হয়। আর তারা হতভাগা হলে আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁর মেহমানের উত্তম ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর ৯০ বছর অতিক্রমকারী যেই সকল আল্লাহবিমুখী গুনাহগার ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবিত থাকবে তাদের মৃত্যুর পরে তো শাস্তি ভোগ করবেনই আবার দুনিয়াতে তার জ্ঞানহীন আল্লাহবিমুখী পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকেও কঠিন লাঞ্ছনার স্বীকার হবে এবং সে দুনিয়ায় থাকা আল্লাহর দুশমন হিসেবে বিবেচিত হবে (নাউযুবিল্লাহ)। এরূপভাবেই, আল্লাহমুখী মুসলিম হয়ে যে ব্যক্তি যতদিনই পৃথিবীতে জীবিত থাকুক না কেন, তার সম্মান বৃদ্ধি হতেই থাকবে। আর আল্লাহ বিমুখী ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে পৃথিবীতে যতদিনই জীবিত থাকবে ততই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে থাকবে। পরিশেষে আখিরাতেও তার একই অবস্থা হবে। বরং আখিরাতে তার শাস্তি আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে।

যদি সে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তার পাপের শাস্তি আস্বাদনের পর একদিন জান্নাতে যেতে পারবে। আর যদি ঈমান গ্রহণ না করে বা ঈমান হারা হয়ে জাহান্নামে যায়, তা আর কোনদিনও শেষ হবে না। কারণ, আল্লাহর সাথে শরীককারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা স্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন।

অতএব, যেই আল্লাহ তায়ালা একজন অস্তিত্বহীন মানুষ থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে বিভিন্ন বয়সে উপনীত করে এত নিয়ামত দান করেছেন। অবশ্যই তার জন্য অবধারিত বিষয় হলো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আল্লাহকে ভয় করা। আর সে জন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা সূরাহ বাকারাহর ২১ নং আয়াতের শেষ অংশে বলেছেন-

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'যেন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর'।

প্রিয় পাঠক, এখন একটিবার চিন্তা করে দেখুন, যেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে একজন অস্তীত্বহীন থেকে ক্রমে ক্রমে যথাঃ প্রথমে নুতফাহ্; তা থেকে পিতার পৃষ্ঠদেশে; তা হতে মাতৃ নিরাপদ আধারে; তা হতে মাতৃগর্ভে; তা হতে রক্তপিন্ডে; তা হতে গোস্ত পিন্ডে; তা হতে অস্থিতে; তা হতে মানবদেহ গঠন তৎপর তাতে রূহ দান। অতঃপর মাতৃগর্ভ হতে শিশুরূপে দুনিয়ায় আনয়ন, তা হতে রিজিক ভক্ষণ, বস্ত্র পরিধান, নিরাপদ বাসস্থান ইত্যাদি। অতঃপর কিশোরে উপনীত, তা হতে যৌবনের উত্তম সময়ে তথা ২৫ বছরে তা হতে বিবাহ, পারিবারিক জীবন, জাগতিক মেধা বৃদ্ধি ইত্যাদি। তা হতে যৌবনের পরিপূর্ণ বয়স তথা ৪০ বছরে উপনীত, তা হতে ৬০ বছর, তা হতে ৭০ বছর ইত্যাদি সময় ও নিয়ামত রাজি দান করলেন। তিনিই তো বান্দাহর ইবাদত বা দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য ও একমাত্র হকদার। আর সেজন্যই আমাদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করতে হবে। আর এটাই হলো- "তাওহীদ আল ইবাদাহ"

আর আল্লাহর সাথে কোন ভাবেই কোন কিছুতেই, কোন কিছুর বা কারো সাথেই অংশীদার স্থাপন করা যাবেনা। যারা মহান আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে অথবা অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহা পাপ করে”। (সূরাহ নিসা, আঃ ৪৮)

আর যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তথা মুশরিক হয়ে যায় তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

“কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম”। (সূরাহ বায়্যিনাহ্, আঃ ৬)

(সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।)

অতঃপর ৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরী ৮ই পৌষ, ১৪৩০ বংঙ্গাব্দ = ২৩/১২/২৩ ইং থেকে আজ ২ সাবান, ১৪৪৫ হিজরী মঙ্গলবার = ৩০ শে মাঘ, ১৪৩০ বংঙ্গাব্দ, শীতকাল = ১৩/০২/২৪ ইং তারিখে লেখা সমাপ্ত করলাম।

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

২। আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

৩। মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)

৪। ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা

৫। ইসলাম পালনের মূলনীতি

৬। মুক্তির পয়গাম

৭। ইসলামে সামাজিক জীবন

৮। তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত

৯। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা

১০। ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি

১১। তা'লিমুত তাওহীদ

ডাউনলোডঃ http://cutt.ly/akhirujjamanbooks